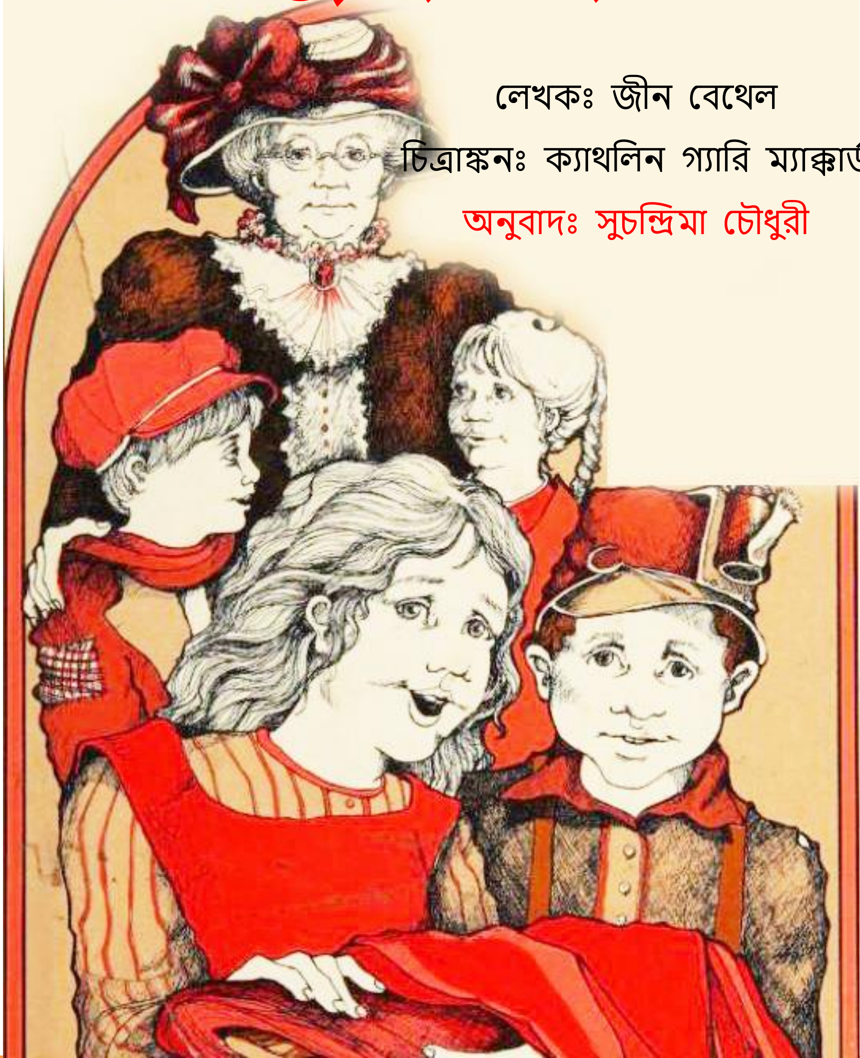
মাদার জোন্স জিন্দাবাদ!



লেখকঃ জীন বেথেল

চিত্রাঙ্কনঃ ক্যাথলিন গ্যারি ম্যাক্কার্ড

অনুবাদঃ সুচন্দ্রিমা চৌধুরী

১৯০৩ সাল। জেমসের তখন মাত্র দশ বছর। সে এক কাপড়ের কলে ২ ডলার প্রতি ঘণ্টা হিসাবে কাজ করে। কিন্তু সে এ কাজ নিজের ইচ্ছেয় করে না। এই কাজ যেমন কঠিন তেমন তাতে জীবনের ঝক্কি। তার ছোট বোন আর আরো অনেক ছোট বাচ্চা তাদের সাথে কাজ করে।

মাদার জোন্স নামে এক বৃদ্ধা বাচ্চাদের দিয়ে কাজ করানো কিছুতেই সমর্থন করতে পারতেন না। তিনি মনে করতেন বাচ্চারা মিলের ভারী কাজ করার জন্য খুবই ছোট। এই ব্যপারে তিনি একদিন রাষ্ট্রপতি থিয়োডর রুজভেল্টের সাহায্য চাইতে এক বিশাল মিছিলের আয়োজন করলেন। জেমসের মত আরো কয়েক শ বাচ্চা ঘর বাড়ী ছেড়ে ওনার সাথে খালি পায়ে রাস্তায় মিছিলে যোগ দিল।

বিশাল মিছিল ফিলাডেলফিয়া থেকে বেড়িয়ে নিউ জার্সি হয়ে নিউ ইয়র্ক শহর পর্যন্ত পৌঁছাল যাতে অয়েস্টারে রাষ্ট্রপতির গ্রীষ্মকালীন আবাসে তাঁর সাথে দেখা করতে পারে সবাই। আর তারপর কি হল জানতে এই বই পড়তে হবে সবাইকে।

অত্যন্ত সহজ ভাষায় আমেরিকান লেখিকার কলমে লেখা এই বই বাচ্চাদের পড়তে খুব ভাল লাগবে। কারণ এই বইতে মজদুরদের সংগঠিত করার কাহিনী জেমসের চোখে দেখা ঘটনাক্রম হিসাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।



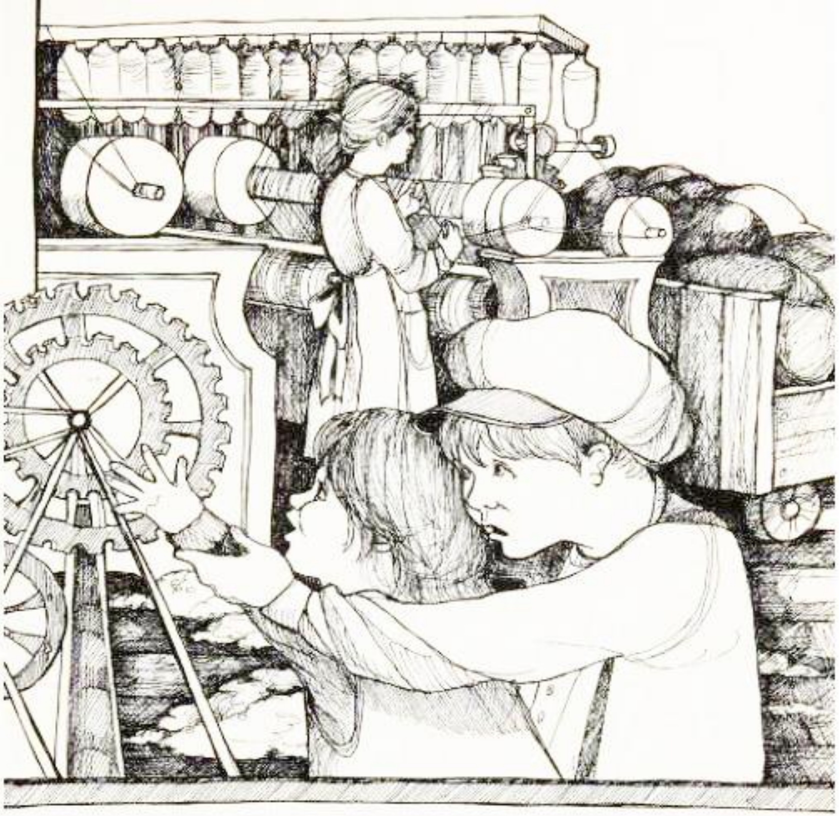
মাদার জোন্স জিন্দাবাদ!

লেখকঃ জীন বেথেল

চিত্রাঙ্কনঃ ক্যাথলিন গ্যারি ম্যাক্কার্ড

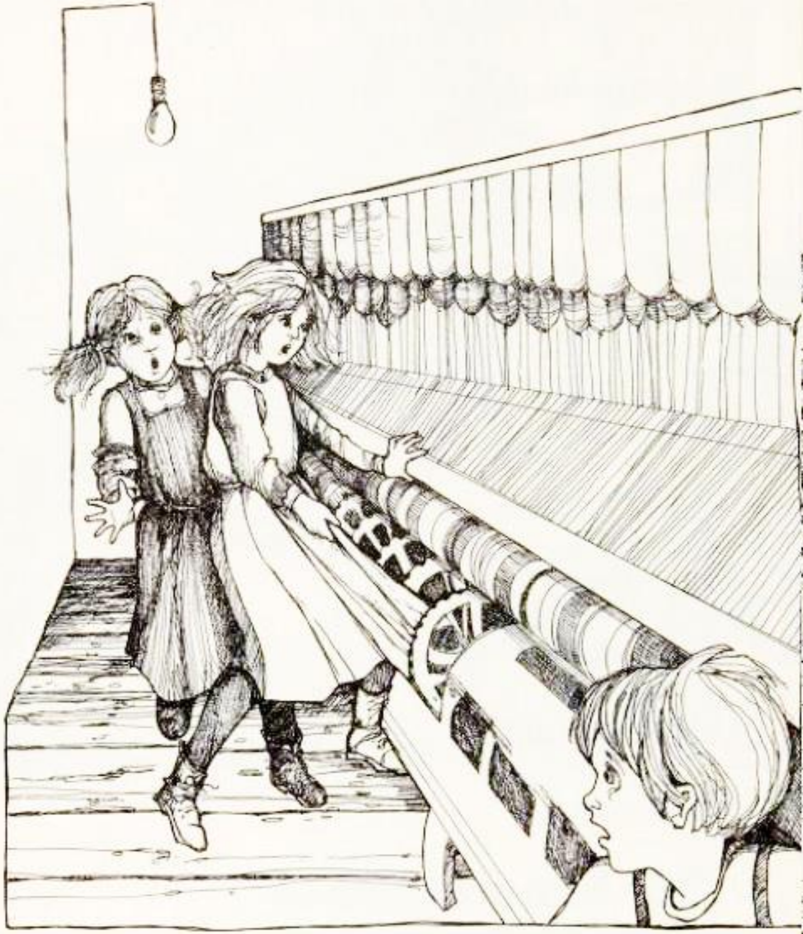
অনুবাদঃ সুচন্দ্রিমা চৌধুরী

সূচীপত্র



অধ্যায় ১
আমার নাম জেমস
ফিলাডেলফিয়া, নভেম্বর ১৯০৩

এ হল আমার বোন এমি।
ওর বয়স মাত্র সাত বছর।
আমরা এই পুরানো আর নোংরা মিলটাতে কাজ করি।
এটা পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ কাজ।



আমরা রোজ বারো ঘন্টা করে কাজ করি।

আমরা স্কুলেও যাই না।

আমরা কখনো বাইরে রোদে বেরোই না।

আমাদের শরীরে সবসময় ক্লান্তি।

কখনো কখনো তো আমাদের অনেক বিপদেরও সম্মুখীন হতে হয়, আমরা আহতও হই।

এর বদলে আমাদের সপ্তাহে দু ডলার করে জোটে।



এখানে আমার বাবাও কাজ করেন।

উনি সপ্তাহে তেরো ডলার পান।

এইটুকু টাকায় আমাদের পরিবার চলে না।

এইজন্য এমি আর আমায়ও কাজ করতে হয়।

আমাদের এই কাজ করতে একেবারেই ভাল লাগে না।

সত্যি কথা বলতে কি, এখানে যারাই কাজ করে তাদের কেউই এখানে কাজ করতে ভালবাসে না।

আমরা মিলের মালিককে খুবই অপছন্দ করি।

উনি ভীষণ কিপ্টে আর আমাদের ঠিকমত পারিশ্রমিকও দেন না।

উনি অনেক বড়লোক, আর আমরা গরীব থেকে আরো গরীব হতে থাকি।

এটা আমাদের খুব অন্যায় বলে মনে হয়।





অধ্যায় ২

এবার এসে গেছেন মাদার জোন্স

ফিলাডেলফিয়া, নভেম্বর ১৯০৩

গেলবার গরমে আমরা এই বিষয়ে কিছু করার চেষ্টা করেছিলাম।

আমরা মিল মালিকের সাথে দেখা করতে গেছিলাম।

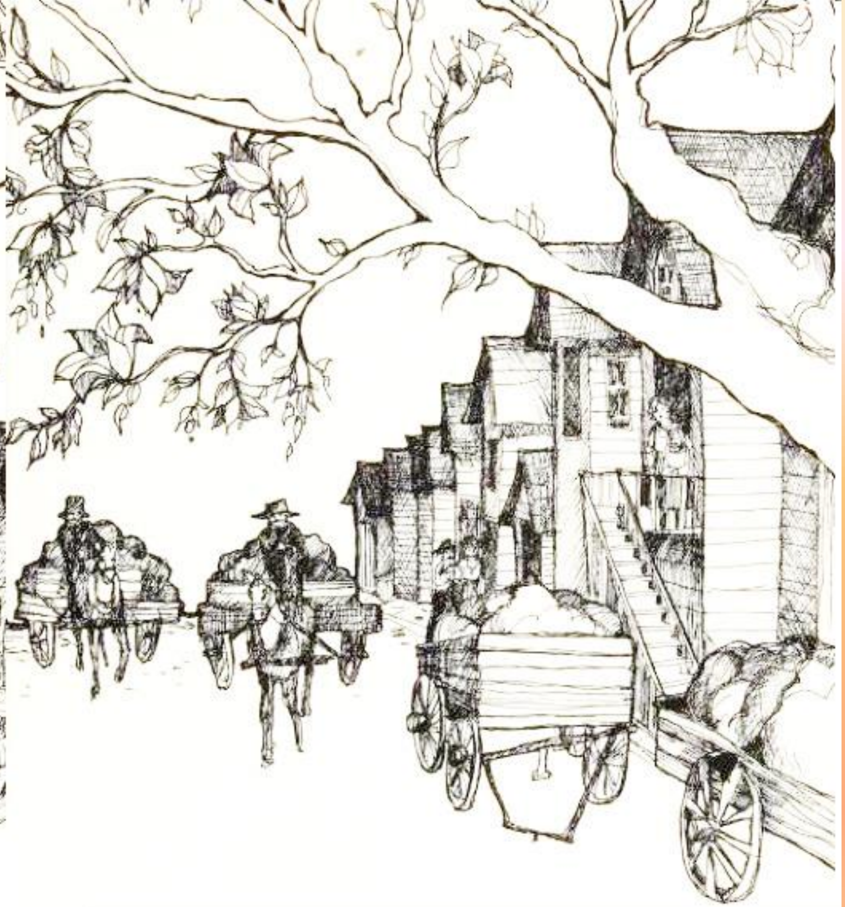
“দয়া করে আমাদের পারিশ্রমিক বাড়িয়ে দিন, যাতে আমাদের বাচ্চাদের মিলে না কাজ করতে হয়।” বাবা বললেন।

আমি সাথে এও বললাম, “আমরা স্কুল যেতে চাই।“

কিন্তু উনি কোনো কথা শুনলেন না।

“যদি চুপচাপ কাজ না শেষ কর তাহলে কাজ থেকে বের করে দেব।“





এই শুনে আমার খুব রাগ হল।

আমরা মিল থেকে বাইরে চলে এলাম।

এরপর আমরা সবাই মিলে হরতাল শুরু করলাম।

আমরা মিলের সামনে দিয়ে মিছিল করে ঘুরতে লাগলাম।

আমরা ভেবেছিলাম মালিক পারিশ্রমিক বাড়ানোর ব্যাপারে কিছু ভাববেন বা কথা বলতে চাইবেন।

তখন মাদার জোন্স নামের এক মহিলা এলেন।

উনি বেশ বয়স্ক ছিলেন- আমার দিদার বয়সী হবেন। কিন্তু অনেক সাহসী মহিলা ছিলেন তিনি।

মিল মালিকের সামনে উনি জোড় গলায় আওয়াজ তুললেন।

“লজ্জা হওয়া উচিত আপনার, তিনি চীৎকার করে বললেন।

“এটুকু বাচ্চাদের দিয়ে বড় মানুষের কাজ করান আপনি!”

“ মাদার জোন্স জিন্দাবাদ!” আমরা সবাই চেঁচিয়ে বলে উঠলাম।

“এই বাচ্চাদের মুক্তি দাও!” কঠিন কণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি।

“এদের মা বাবাদের ঘর চালাবার মত বেতন তো দিন!”

“কক্ষনো না!” মিল মালিক রাগে গর্জে উঠলেন।

“আমরা রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করব!” মাদার জোন্স ঘোষণা করলেন।

“উনি আমাদের জন্য কি বা করতে পারেন?” আমার বাবা জানতে চাইলেন। “উনি কি আমাদের মজুরি বাড়াতে পারেন? উনি কি আমাদের বাচ্চাদের মিলে যাওয়া আটকাতে পারেন?”

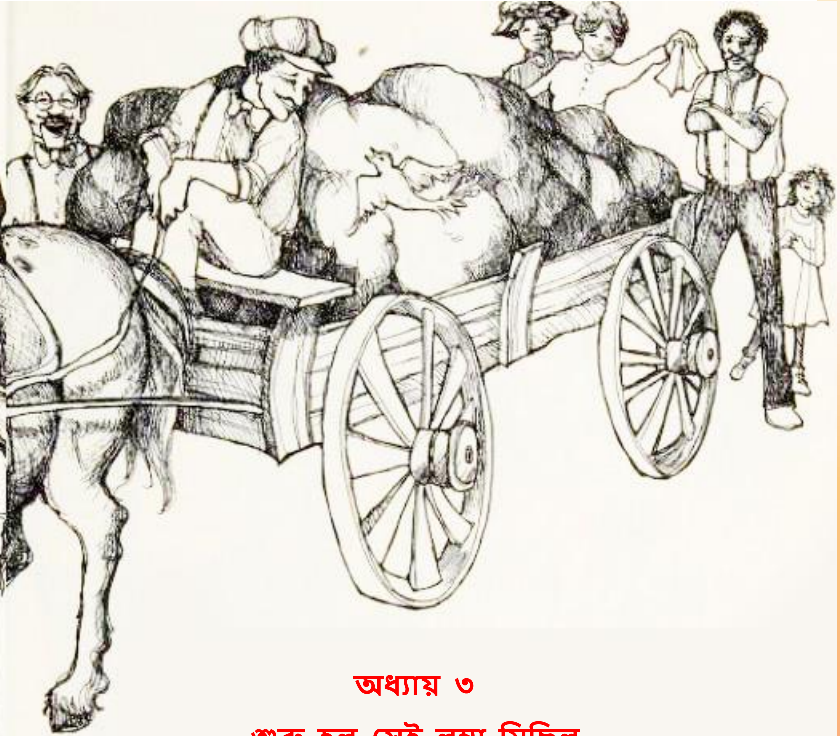
“ চলো আমরা নিজেরাই গিয়ে দেখি। আমরা ওনার কাছে সাহায্য চাইব। লোকেদের সাহায্য করাই তো একজন রাষ্ট্রপতির কাজ।“

“কি মজা!” আমরা সবাই আনন্দে চীৎকার করে উঠলাম।

“চলো, রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করি।“







অধ্যায় ৩

শুরু হল সেই লম্বা মিছিল

ফিলাডেলফিয়া, জুলাই ১৯০৩

খবরের কাগজে আমাদের মিছিলের কথা বিরাট করে ছাপা হয়।

ঐ অঞ্চলের সবাই আমাদের যাত্রার আগে বিদায় জানাতে আসে।

মাদার জোন্স মিছিলের অগ্রভাগে এসে পদযাত্রার সূচনা করেন।

আমি আর আমার বাবা ছিলাম ঠিক ওনার পিছনে। আর আমাদের পিছনে ছিল মোটামোটি দুইশ জন। এমিও আমাদের সাথে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু ও অনেক ছোট বলে মায়ের সাথে ঘরেই ছিল।



কি বলব কি মজাই না করেছি সেদিন। গান বাজছিল।

সবাই স্লোগান দিচ্ছিল, জয়ধ্বনি দিচ্ছিল। আর আমরা সবাই মিছিল করে চলছিলাম।

এক-দুই-তিন-চার!

আমাদের পায়ে হেঁটে অনেক দূর যেতে হবে।

রাষ্ট্রপতির গ্রীষ্মকালীন ঘর ছিল অনেক দূর, পুরো ১২৫ মাইল দূর।

এক-দুই-তিন-চার!

কিন্তু আমাদের কারোর মনে কোন সংশয় ছিল না।

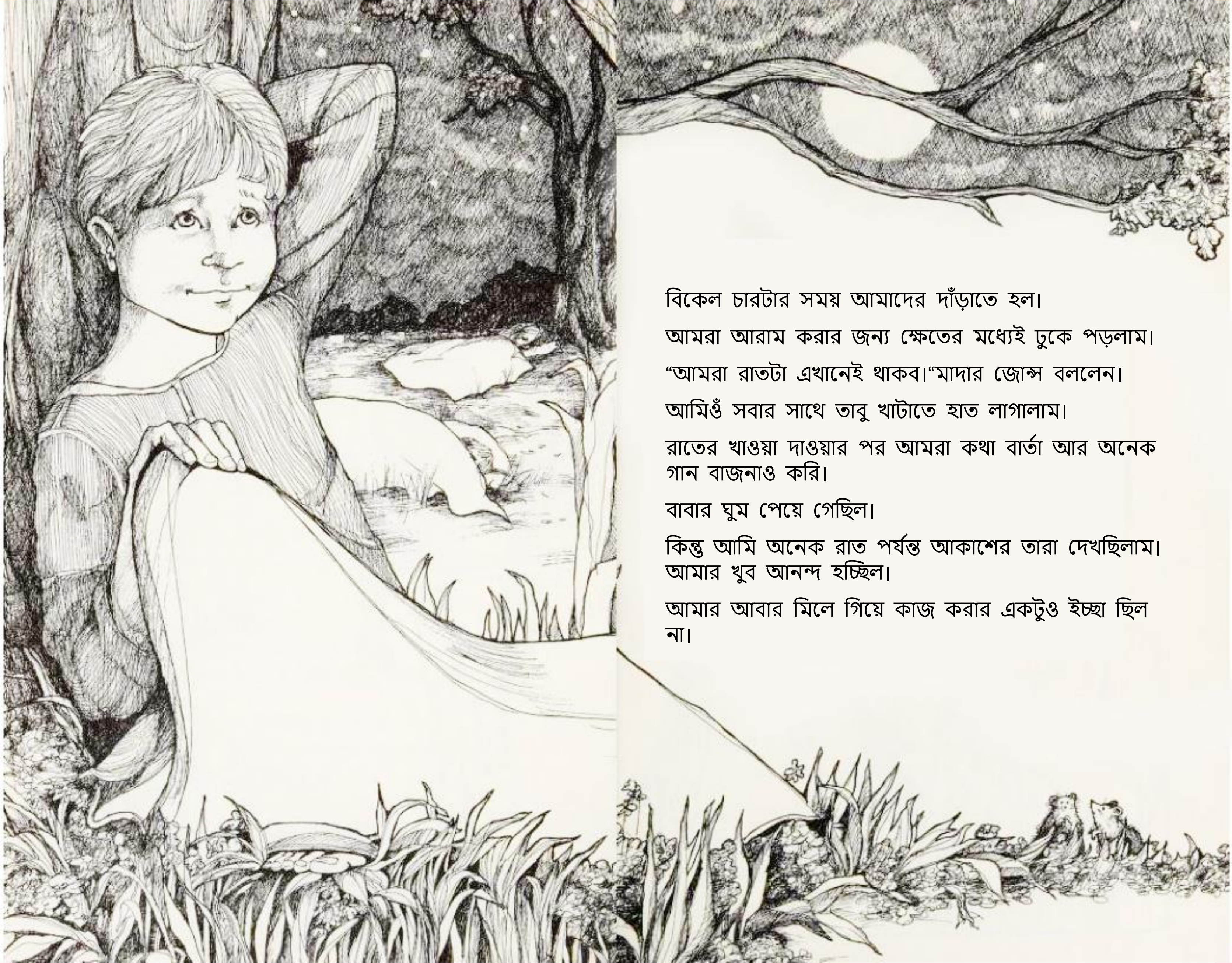
আমরা শুধু ঐ নোংরা আর পুরানো মিলের থেকে বাইরে যেতে পেরে খুব খুশী ছিলাম।

রাস্তায় লোকজন আমাদের খাবার আর জল দিচ্ছিল। আমরা চলতে চলতেই দুপুরের খাবার খেলাম। দিনের বেলা খুব গরম ছিল। তাই কিছুক্ষণ পরই আমাদের গতি ধীর হয়ে এল। আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম।

মাদার জোন্সও ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন।

আমি ওনাকে বসতে সাহায্য করলাম। উনি ছোট বাচ্চাদের ওনার পাশে নিয়ে বসলেন।





বিকেল চারটার সময় আমাদের দাঁড়াতে হল।

আমরা আরাম করার জন্য ক্ষেতের মধ্যেই ঢুকে পড়লাম।

“আমরা রাতটা এখানেই থাকব।“মাদার জোন্স বললেন।

আমিওঁ সবার সাথে তাবু খাটাতে হাত লাগালাম।

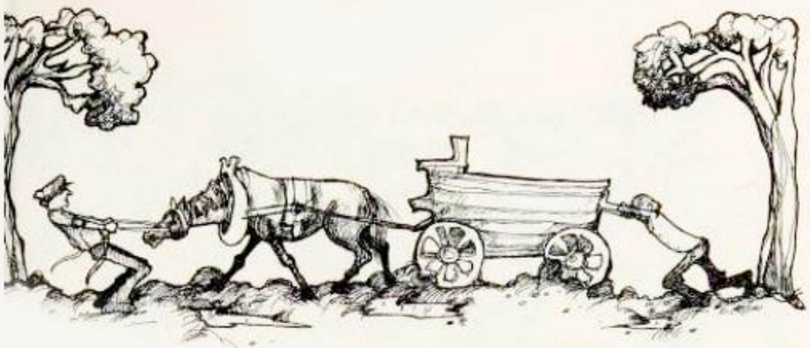
রাতের খাওয়া দাওয়ার পর আমরা কথা বার্তা আর অনেক গান বাজনাও করি।

বাবার ঘুম পেয়ে গেছিল।

কিন্তু আমি অনেক রাত পর্যন্ত আকাশের তারা দেখছিলাম। আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল।

আমার আবার মিলে গিয়ে কাজ করার একটুও ইচ্ছা ছিল না।





অধ্যায় ৪

আমাদের সামনে অনেক বাঁধা

পেনিসিল্‌ভেনিয়া, ৮-১০ জুলাই ১৯০৩

পরের দিন অনেক গরম ছিল। সুর্যের তেজে চারিদিক ঝলসে যাচ্ছিল। আমাদের গতি ধীর থেকে ধীরতর হতে লাগল।

কেউ কেউ অসুস্থ ও হয়ে পড়ল।

“এবার ভাই আমাদের ফিরে যেতে হবে।“ কেউ কেউ বলতে শুরু করল।

“এই গরম তো আর সহ্য হচ্ছে না।“ এই বলে লোকজন অনেকেই ফিরে গেল।

দ্বিতীয় দিনের শেষে মাত্র শ খানেক লোক পড়ে রইল।

“ধৈর্য ধর।“ মাদার জোন্স সবার উদ্দেশ্যে বললেন।

“আমাদের এখনো অনেক দূর যেতে হবে।“

তৃতীয় দিন শুরু হল বৃষ্টি। রাস্তা কাদা আর জলে ভরে গেল। আমাদের সাথে যত গাড়ী ছিল তার চাকা মাটিতে বসে যেতে লাগল। আমি বড়দের সাথে ঐ সব গাড়ী ধাক্কা দিতে সাহায্য করলাম।

এরপর শুরু হল পোকামাকড়ের হামলা।

কানের কাছে সব বোঁ বোঁ করতে লাগল আর কোনোটা শুরু করল হূল ফোটাতে। আমাদের সবাইকে একেবারে পাগল করে ছাড়ল এই পোকামাকড়ের দল।

আর এর ফলে স্বভাবতই আরো বেশ কিছু লোক ঘরে ফিরে গেল।

এর পরের দিন বাবার পায়ে চোট লাগল।

ওনার পক্ষে পায়ে হেঁটে চলাই দুষ্কর হয়ে উঠল।

“চল, এবার আমরাও ঘরে ফিরে যাই।“ আমার বাবা বললেন।

“আমায় এখানেই থাকতে দাও না, বাবা!”

“ আমি রাষ্ট্রপতিকে দেখতে চাই।“

“ঠিক আছে, জেমস। তুমি নিশ্চই পারবে।“উনি আমায় জড়িয়ে ধরে আশ্বাস দিলেন আর চলে গেলেন।

মাদার জোন্স আমায় দেখে মিষ্টি করে হাসলেন।

“সাবাস! এইরকমই তো চাই। লেগে থাক। হাল ছেড় না।“

“নিশ্চই!” আমি বললাম। “আপনি যদি পদযাত্রা চালু রাখেন তাহলে আমিও চলতে রাজী আছি আপনার সাথে।“





অধ্যায় ৫

নিউ জার্সি পার হলাম

নিউ জার্সি, ১১-২৩ জুলাই ১৯০৩

পুল পার করে আমরা যখন নিউ জার্সি পৌঁছালাম তখন আমরা মোটে সাত জন।

“তোমরা সবাই দারুন করেছ!” মাদার জোন্স উতসাহ দিলেন।

আমরা দিনের বেলা চলছিলাম। মাঝে মাঝে দাঁড়াচ্ছিলাম। সেসব জায়গায় মাদার জোন্স ভাষণ দিতেন।

লোক জড়ো হত। তাঁর ভাষণ শেষ হলে আমরা টুপি নিয়ে ঘুরতাম, তাতে লোকে পয়সা দিত।

আমাদের অভিযান লোকেদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। খবরের কাগজে একে “মিলের বাচ্চাদের মিছিল” নাম দিল।





এক রাতে আমরা তো হোটেলে থেকেছিলাম।

আমি তো এর আগে কখনো হোটেল দেখিনি। আমার তো হোটেলটা খুব ভাল লেগেছিল। শোবার জন্য আমার একার পুরো একটা বিছানা দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু বেশীরভাগ দিন ই আমরা হয় কারোর ক্ষেতে নয়ত কারোর খালি বাড়ীতেই শুতাম।



আমি খুব ক্লান্ত ছিলাম। আমার জামাকাপড়ও খুব নোংরা হয়ে গেছিল।

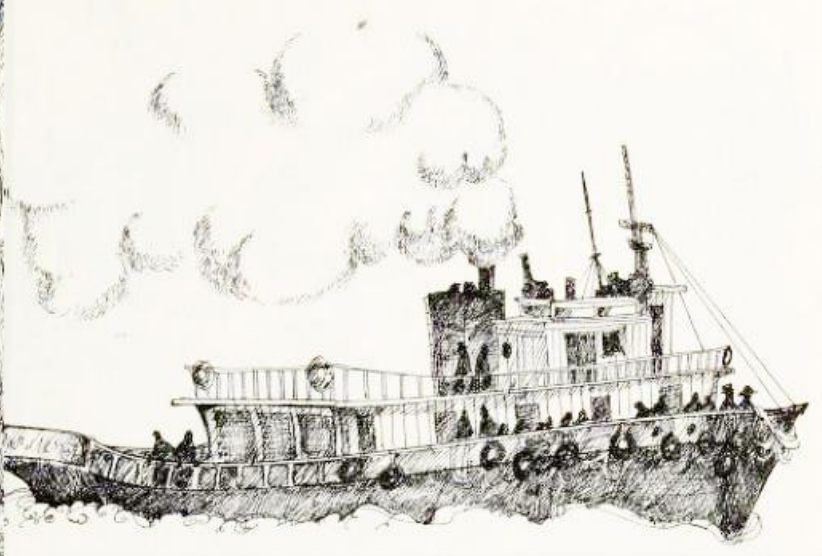
কিন্তু আমার সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল না। আমি রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করতে যাচ্ছিলাম যে!

আমি মনে মনে ভাবতাম এমনো তো হতে পারে যে উনি আমার সাথে হাত মেলাতে চাইলেন!

আমরা চলতেই থাকলাম। অবশেষে আমরা হাডসন নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছালাম।

নদীর ওপাড়ে নিউ ইয়র্ক শহর দেখা যাচ্ছিল।

আমরা ওখানে পৌঁছানোর জন্য উতলা হয়ে উঠেছিলাম।



অধ্যায় ৬

অবশেষে নিউ ইয়র্ক পৌঁছালাম

২৩ শে জুলাই, ১৯০৩

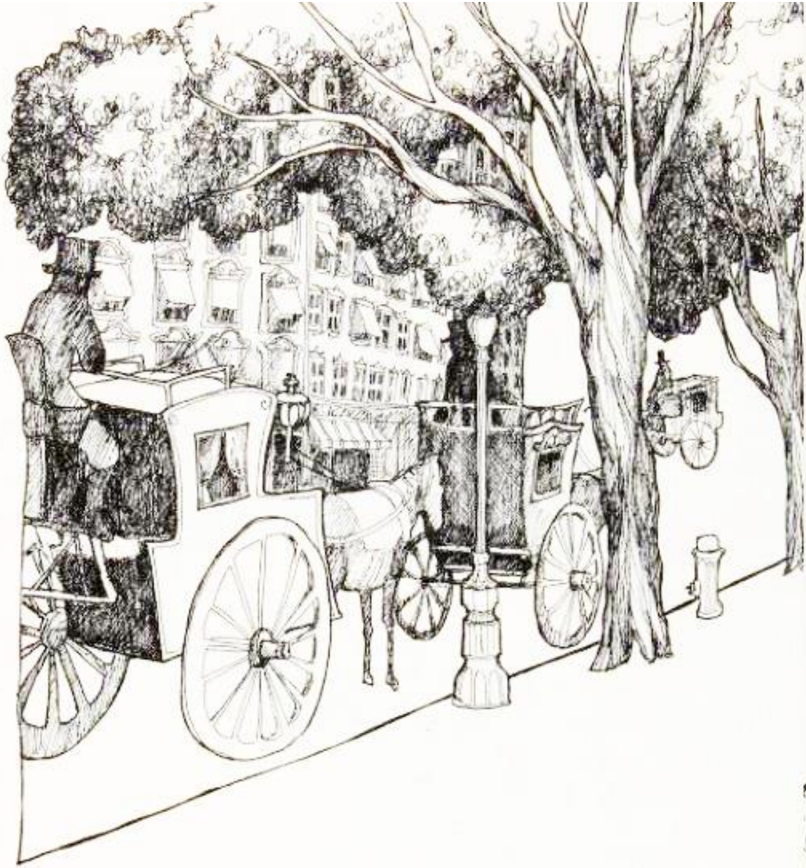
আমরা একটা বড় নৌকায় করে নদী পার করলাম। খুব মজা হয়েছিল। আমার ইচ্ছে করছিল সারাদিন নৌকাতেই কাটাই।

অবশেষে আমরা নিউ ইয়র্ক পৌঁছালাম।

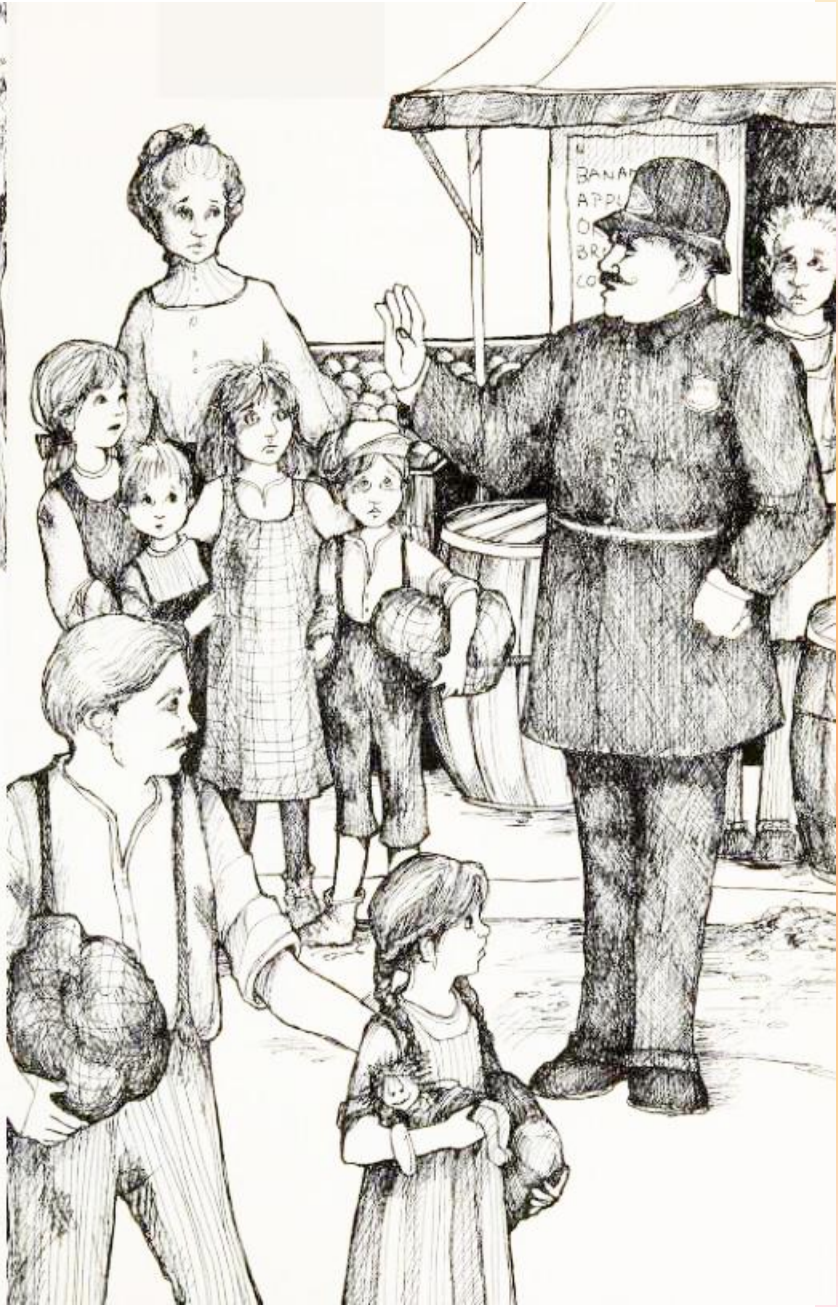
কি দারুন শহর!

কত লোক! কত উঁচু উঁচু বাড়ী!

আর কত যে কোলাহল চারিদিকে!



“থামো!” পুলিশওয়ালা আমাদের থামাল।
“তোমরা এখানে কোনো মিছিল করতে পারবে না।“
আমি তো ভয়ে একদম কুঁকড়ে গেলাম।



“বাজে কথা বোলো না!” মাদার জোন্স বললেন।

“আমি মেয়রের সাথে কথা বলব।“

“আমাদের এই পদযাত্রা আপনি থামতে দেবেন না, মেয়র সাহেব!”

“নিশ্চই “, মেয়র বললেন।

“আমার পদযাত্রা ভাল লাগে।“







পদযাত্রা খুবই সফল ছিল।

প্রচুর লোক আমাদের দেখতে এল।

মাদার জোন্স আমাকে মঞ্চের উপর চড়ালেন।

“এই বাচ্চাটাকে দেখুন। একে মিলে কাজ করতে হয়, যাতে ওর দুবেলা খাবার জোটে।“

“আমি স্কুলে যাই।“আমি বললাম।

“আমি লেখা পড়া শিখতে চাই।

লোকেরা সবাই আমাদের অনেক উতসাহ বাড়াল। পরের দিন খবরের কাগজে আমাদের নিয়ে খবর ছাপা হল। মাদার জোন্স আমায় পড়ে শোনালেন।

আমার পরিবারের সবাই আমার উপর অনেক খুশী হল, তারা আমার জন্য গর্বিত হল।







অধ্যায় ৭

কোনি দ্বীপ যাত্রা

কোনি দ্বীপ, ২৭ জুলাই ১৯০৩

আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ছিল কোনী দ্বীপ।

আমরা ওখানে সমুদ্রের পার ধরে অনেক ঘুরলাম।

আমরা জংলী জানোয়ারদের তামাশা দেখলাম।

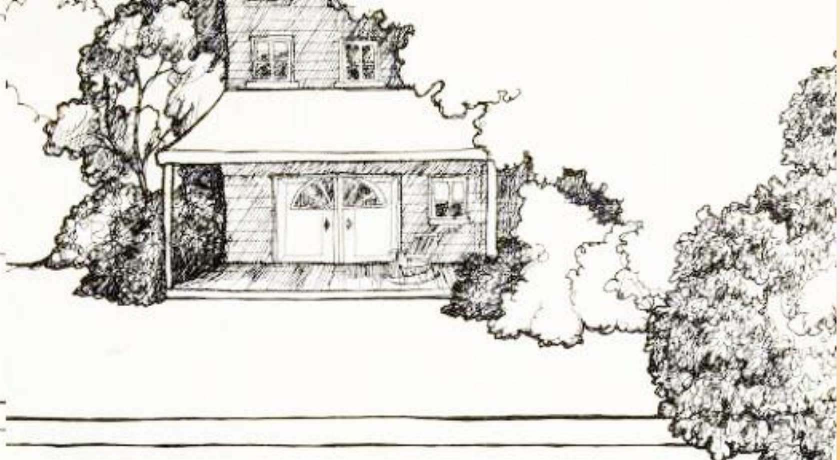
ঐ রাতে যখন মাদার জোন্স ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন আমরা খালি খাঁচায় ঢুকলাম। আমরা জংলী জানোয়ারদের মত চীৎকার করলাম।

আমরা খাঁচার শিখগুলো ধরে জোড়ে জোড়ে হিলিয়েছিলাম।

"এই বেচারা বাচ্চাদের দেখুন," মাদার জোন্স বললেন।

"এরা মিলের মধ্যে জানয়ারদের মত কয়েদ হয়ে থাকে। শিশু শ্রম একটা অপরাধ। আমাদের আইন বদলাতে হবে। থিয়োডর রুজভেল্ট আমরা আসছি!"





অধ্যায় ৮

রাষ্ট্রপতির গ্রীষ্মকালীন আবাস

ওয়েস্টার বে, ২৯ শে জুলাই ১৯০৩

মাদার জোন্স আমাদের পাঁচ বাচ্চাদের সাথে রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন।

আমি অনুমান করতে লাগলাম রুজভেল্ট সাহেব আমাদের সাথে কি কথা বলতে পারেন।

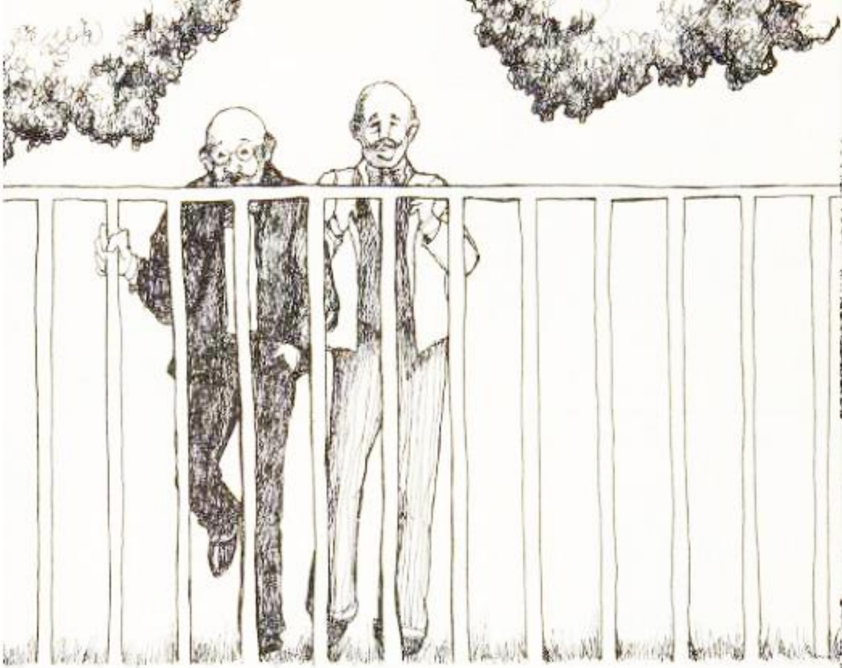
আমরা ওনার আবাসের দরজায় পৌঁছালাম।

পাহাড়ের উপর বানানো ওনার মস্ত বাড়ী আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম।

কিছু বাচ্চা বাড়ীর সামনে খেলা করছিল।

"এই বাচ্চারা কত ভাগ্যবান," মাদার জোন্স বললেন।

"ওদের মিলে কাজ করতে হয় না।"



দুজন লোক ফটকে এসে দাঁড়ালেন। “মাদার জোন্স?” ওরা জিজ্ঞাসা করলেন।

“রাষ্ট্রপতি আপনাদের সাথে দেখা করতে পারবেন না।“

মাদার জোন্স কঠিন হয়ে গেলেন।

“উনি আমাদের সাথে দেখা করবেন না? আমরা ২২ দিন পায়ে হেঁটে এখানে এসেছি। আর উনি আমাদের সাথে দেখা পর্যন্ত করবেন না?”

“মাফ করুন ম্যাডাম, মি রুজভেল্ট জানিয়েছেন উনি আপনার কোনো সাহায্য করতে পারবেন না।“





"মাফ করো বাচ্চারা," মাদার জোন্স নিরাশ হয়ে বললেন।

"মন খারাপ কোরো না, আমরা সবরকমের চেষ্টা করেছিলাম," আমি সবাইকে বললাম।

কিন্তু সবারই মন খুব ভেঙ্গে গেল। আর তার সাথে আমারও। আমি মিলে আর ফাইল যেতে চাইছিলাম না।

কিন্তু সব খেলাই তো শেষ হয়ে গেছিল। আমাদের অভিযান অসফল হয়ে গেল।

আমরা ট্রেনে করে ফিরে এলাম।



অধ্যায় ৯

মিলের কাজে ফেরা

ফিলাডেলফিয়া, নভেম্বর ১৯০৩

আমি আবার সেই পুরানো কাজের জায়গায় আবার ফিরে এলাম।

এমি আর আমি এখনো সপ্তাহে দুই ডলার করে পাই।

মিল শোরগোলে ভরা আর সেই আগের মতই নোংরা।

আমার এখনো এসব দেখলেই ঘেন্না করে, আসতে ইচ্ছে করে না।

একটু দাঁড়াও। শোনো ত! এই শোরগোল কিসের?

লোকজন এত খুশীতে হৈহল্লা করছে কেন?



আরে! এ তো মাদার জোন্স! উনি আবার এসেছেন!

“তোমাদের জন্য এক দারুন খুশীর খবর আছে,” উনি বললেন। “আমাদের পদযাত্রা পুরোপুরি অসফল ছিল না। গভর্নর আমাদের সাহায্য করবেন।“

“দারুন! দারুন! মাদার জোন্সের জয়!”

“দেখবে কোনোদিন আইন নিশ্চয়ই বদলাবে,” উনি আমাদের বললেন। “কোনোদিন ঠিক তোমাদের জীবন আর পরিস্থিতি নিশ্চয়ই বদলাবে,” উনি আমাদের বললেন।

বাবা, আমি আর এমি এই শুনে খুশী হয়ে গেলাম। এখন এমন তো কিছু আছে যার আশায় আমরা দিন গুণতে পারি!



লেখকের টিপ্পনী

মাদার জোন্স নামের এক মহিলা ছিলেন। উনি নিজের পুরো জীবনটাই বাচ্চাদের আর বড় শ্রমিকদের জীবনের উন্নতির জন্য কাটিয়ে দিয়েছিলেন।

১৯০৩ সালে, আমেরিকায় ১০ লাখ পুরুষ আর মহিলা শ্রমিক খাবার, মিল আর কারখানায় কাজ করতেন যাদের বয়স ১৪ এর কম ছিল।

মাদার জোন্সের কাজ খুব কঠিন আর বিপজ্জনক ছিল। কিছু কিছু বালশ্রমিকদের মিলের বা কারখানার কয়লার গুঁড়ো আর তুলোর মিহি রোঁয়া থেকে ফুস্‌ফুসের আর শ্বাসপ্রশ্বাস সংক্রান্ত রোগ হত। কতজনের কারখানার মেশিনে হাত বা পা কাটা যেত। আর সবচেয়ে দুঃখের হল কত ছেলেমেয়েদের এই কারখানায় কাজের জন্য স্কুলে যাওয়া হত না। ওরা নিরক্ষরই রয়ে যেত।

১৮৭০ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত মেরী হ্যারিস জোন্স ওরফে মাদার জোন্স বাচ্চাদের কাজের পরিস্থিতি শুধরাবার চেষ্টায় লড়ে গেছেন। তিনি পশ্চিম ভার্জিনিয়ার কয়লা খনি থেকে কলোরাডোর তামার কারখানা পর্যন্ত, আর পেনিসিল্‌ভেনিয়া থেকে অ্যালাব্যামা পর্যন্ত সব কাপড়ের মিলে মিলে যেতেন। সেসব জায়গায় গিয়ে ভাষণ দিতেন, প্রদর্শনী করতেন, শ্রমিকদের একজোট হবার জন্য উস্কানি দিতেন। উনি আমেরিকার প্রথম মহিলা ছিলেন যিনি মজদুরদের সঙ্গঠিত করেছিলেন।

যে সময় মাদার জোন্স বাচ্চাদের নিয়ে পদযাত্রা করে থিয়োডর রুজভেল্টের সাথে দেখা করতে গেছিলেন, তখন তিনি বাহাত্তর বছরের ছিলেন। কিন্তু যদিও রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট নিজে বালশ্রমের বিরুদ্ধে ছিলেন তবু তিনি কংগ্রেস দলকে এই প্রথা রোধ করার জন্য আইন প্রণয়ন করতে রাজী করাতে পারেন নি। এই আইন বানাতে আর লাঘু করতে আরো ৩৫ বছর লেগে যায়।

কিন্তু মিলে কাজ করতে যাওয়া বাচ্চাদের পদযাত্রা পুরো অসফল ছিল না। মাদার জোন্স নিজের আত্মজীবনীতে এই ঘটনার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেনঃ

আমরা দেশের মানুষের নজর বালশ্রম নামক জুলুমের দিকে আকর্ষণ করি। যদিও কাপড় মিলের শ্রমিকদের হরতাল অসফল ছিল আর বাচ্চাদের আবার সেই মিলের আর কারখানার কাজে ফিরে যেতে হয় কিন্তু কিছুদিন পর পেনিসিল্‌ভেনিয়ার বিধান সভায় বালশ্রমের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করা হয় যাতে ১৪ বছরের কম বয়সের বাচ্চাদের মিলের পরিশ্রম সাপেক্ষ কাজ থেকে বিরত করতে বলা হয়।

